International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-V, Issue-III, May 2019, Page No. 20-28
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i3.2019.20-28

রবীন্দ্র জীবন চর্চা ও চর্যায় প্রতিফলিত দুঃখবোধ ও মৃত্যুচেতনা: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

অতসী মহাপাত্র
সহকারী অধ্যাপিকা, শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়, চকশ্রীকৃষ্ণপুর, কুলবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Rabindranath Tagore is the right representative of Indian philosophy. He did not write a systematic philosophical treatise but authored many essays and lectures in which he depicts his worldview in a poetic way. The lonely sensitive child Rabi was passionately fond of Nature, his loving companion throughout life. He sang of life's lilting joys and poignant sorrows, its deep longings and passionate strife. He revealed to us many a secret that mocks our minds, and grateful humanity has showered many honours upon him. He stood for a simple life and a pure heart, a clear spiritual vision and harmony with the universe. In his personal life, he had faces many number of tragic events in his family and other relatives. Tagore was considered a great poet of sorrow as well as joy. For him, joy is simply sorrow unmasked. All the sorrow of the world will be swallowed up in doing good. It is symbolised the infinite possibility of perfection, the eternal unfolding of joy. All progress is sacrifice, and life itself is an eternal process of birth and death. In materialistic thinking, death is a full stop of life process. Unlike that, Tagore does not consider death to be the final extinction of soulhood. Death is the force of mobility, because of death things around us move on, grow and decay. Life and death are mere phases of manifestation of the same life force which is immortal and endless. This paper is focuses on feeling of sorrow and death in Tagore's principle and practice of life.

Keywords: Death; Endless; Humanity; Indian philosophy; Worldview.

> *'জন্মিলে মরিতে হবে অমরকে কোথা কবে*
> *চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে!'*

- একথা সর্বজনবিদিত সত্য। কিন্তু একথার উপলব্ধি অত্যন্ত জটিল। অনন্তকাল ধরে মানুষ জন্মেছে আবার মৃত্যুও বরণ করেছে। তবুও মৃত্যুর স্বরূপ আজও মানুষের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এবং এই কারণে তা ভীতিপ্রদ ও চিররহস্যময়। তা সত্ত্বেও মানুষ যুগ যুগ ধরে মৃত্যুর স্বরূপ জানতে আগ্রহী হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষ জীবন নিয়ে যত না চিন্তা করেছে মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করেছে অনেক বেশী। জ্ঞান উন্মেষের পর থেকে সে জানতে চেয়েছে আমি কে? আমার স্বরূপ কি? মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা? প্রভৃতি নানাবিধ প্রশ্ন। মনুষ্যজীবনে মৃত্যু হল এমন

একটি ঘটনা, যার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মানুষ লাভ করতে পারে না। কেবলমাত্র অপরের মৃত্যু দেখে মানুষ সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও গবেষকরা মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা সমৃদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এর ব্যতিক্রম নয়। মৃত্যুর ব্যথাবেদনার অনুভুতিকে তিনি কেবলমাত্র কল্পনা বিলাসিতায় উপলব্ধি করেননি, বরং মৃত্যুকে তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অনুভব করেছেন। তাঁর সুখ, দু:খ, জীবন, মৃত্যু সম্বন্ধে দার্শনিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় শৈশবকালীন নানা বিচিত্র উপলব্ধির মধ্যে। নিতান্তই শৈশবকাল থেকেই তিনি মৃত্যুকে শান্ত সমাহিত রূপে দর্শন করার সামর্থ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মৃত্যুতে জীবনের সবকিছু বিনাশ ঘটে না। মৃত্যু ও দুঃখের মাধ্যমে তিনি মুক্তি লাভ করে পরিপুর্ণ সত্যে উপনীত হতে চেয়েছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবন চর্চা ও চর্যায় দুঃখের বোধ ও মৃত্যুচেতনা কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কারণ গুলির মধ্যে অন্যতম হল মানুষের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় শৈশবে তিনি অন্যান্য শিশুদের মতো মায়ের সান্নিধ্য পাননি। মাতা সারদাসুন্দরীদেবী শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের জন্মদায়িনী ছিলেন, স্তন্যদায়িনী, বা স্নেহদায়িনী ছিলেন না।[১] শিশু রবীন্দ্রনাথ পরিবারের দাসদাসীদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছিলেন। শৈশবের মতো কৈশোরেও পিতামাতা কাউকেই তিনি অনায়াস ও সাবলীল ভাবে কাছে পাননি রবীন্দ্রনাথ। এর ফলে তাঁর প্রথম জীবন প্রায় বন্দীদের মতো অতিবাহিত হয়েছিল, তার উপরে ছিল দাসদাসীদের অবর্ণনীয় অত্যাচার- জীবনস্মৃতিতে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর ফলে শৈশবকাল থেকেই তার মধ্যে নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, ও একাকীত্বের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে এই একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গ থাকার প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের শুধুমাত্র শৈশবেই নয়, তা সারাজীবনভর ছিল।

এর ফলস্বরূপ শৈশবকাল থেকেই তাঁর মধ্যে একটা নিঃসঙ্গ দর্শন প্রবণতা ছিল, এটি তাকে জীবনের পরবর্তী পর্যাযগুলিতে চিন্তাশীল ও মননশীল করে তুলেছিল।[২] আপন মনে নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, ও একাকীত্বের ভাবনা, যেগুলি সাধারণ মানুষের মনে ভীতি, বিরক্তি সঞ্চার করে, সেগুলি রবীন্দ্রনাথের মনে একটি বিচিত্র দার্শনিক ভাবের সূচনা করেছিল। তাই পরিত্যক্ত গোলাবাড়ি, নির্জন দুপুর, বাড়ির ছাদ সবকিছুই তাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, 'জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে'।[৩] বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, ও একাকীত্বের বিচিত্র রস উপলব্ধি করতে ভালবাসতেন। তাঁর একটি বিশেষত্ব হল তিনি সকলের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ ও একক হয়ে থেকেছেন।[৪] জীবন সম্পর্কে এরূপ উদাসীন ও নির্লিপ্ত মনোভাবের জন্য তিনি সম্ভবত বারংবার দুঃখের আঘাত, এমনকি মৃত্যুর আঘাতেও বিচলিত হননি; এগুলিকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তবে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, ও একাকীত্ব প্রভৃতি মানসিক প্রবণতাগুলি তাঁর দার্শনিক ভাবনার অণুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করলেও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে মিলন, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডতা, আংশিক থেকে সমগ্রতা, অপুর্ণতা থেকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া হল রবীন্দ্র দর্শনের মুল কথা। রবীন্দ্রমননে সীমা এবং অসীম উভয়ই হল একপাক্ষিক সত্য, উভয়ের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ সত্যে উপনীত হওয়া যায়। যিনি সীমার মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করতে পারেন, কিংবা বলা যায়, যিনি সীমার মধ্যে অসীমের মেলবন্ধন ঘটাতে সক্ষম হন, তিনি মৃত্যুকে জয় করে অমরত্ব লাভে সক্ষম হবেন।[৫] এইভাবে আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে দার্শনিক ভাবধারার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা নানাভাবে দুঃখকে অনুভব করে থাকি। শোক, ব্যথা, বেদনা, জরা, নিরুপায়তা, অসহায়তা প্রভৃতির মাধ্যমে দুঃখের প্রকাশ ঘটলেও, এর চরম পরিণতি ঘটে মৃত্যুতে। রবীন্দ্রনাথের এক জীবনে এত বিপুল বিচিত্র বেদনা, বিড়ম্বনার অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। মনোদর্শনের প্রেক্ষাপটে এই দুঃখ, বেদনার

অনুভূতির প্রতিক্রিয়াও বিশেষভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ। বাস্তব জীবনে রবীন্দ্রনাথ দ্বিবিধ দুঃখের দ্বারা পীড়িত ছিলেন।[৬] একটি হল মৃত্যুশোক জনিত, যা এসেছিল, যা এসেছিল সর্বজনবিদিত মৃত্যুর ধারণার মধ্য দিয়ে। এটি মানুষকে নিঃসঙ্গ ও একাকী করে তোলে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও নিকট পরমাত্মীয়দের মৃত্যু তাঁকে এই প্রকার এই দুঃখ দিয়েছিল। রবীন্দ্র মননে স্বীকৃত দ্বিতীয় প্রকার দুঃখ হল বিপন্নতাজনিত দুঃখ, যা তাঁর জীবনে এসেছিল জীবিতদের দেয় লাঞ্ছনা, গঞ্জনার মধ্য দিয়ে। এটি তাঁকে কাতর ও মর্মাহত করে তুলেছিল। কতকগুলি অপরিণত, অপরিশীলিত অপরিণামদর্শী প্রিয়জনদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ এই প্রকার দুঃখ পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতৃস্মৃতিতে লিখেছেনঃ 'বহুকাল পর্যন্ত বাবাকে এবং মা যতদিন বেঁচেছিলেন তাঁদের বাড়ির লোকজনদের কাছ থেকে বিদ্যালয় সম্পর্কে (শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে)বিরূপতা ও বিরুদ্ধতা সহ্য করতে হয়েছিল'। এইভাবে জীবিত ও মৃত উভয়ের দিক থেকে দুঃখ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবে ব্যক্তিগত জীবনে এইসব দুঃখের প্রকাশ খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির নানা ধারা উপধারায় ছড়িয়ে রয়েছে তার দুঃখভাবনা। দুঃখ হল মানুষের জীবনে একটি অকৃত্রিম অনুভূতি, যাকে বোঝা যায়, কিন্তু বোঝানো যায় না। যে দুঃখিত হয়, শোকার্ত হয়, যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়, একমাত্র সেই এই অনুভুতি বোঝে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে ব্যপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছে দুঃখ হল বিচিত্র, গভীর এবং বহুমুখী। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে একমত হয়ে তিনি স্বীকার করেন যে, দুঃখের মধ্য দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশ ঘটে থাকে। 'মানুষের জীবনের জন্য যেমন বায়ু আবশ্যক, তেমনি মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্যও দুঃখের প্রয়োজন রয়েছে। জ্ঞানের চোখে যাকে আমরা দুঃখ বলি, অনেক সময় তা থেকে সুখেরও উৎপত্তি ঘটে'।[৭] কিন্তু সাধারণ মানুষ দুঃখ পরিহার করে সুখ করতে চায়। রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে নৈরাশ্যের সাথী হিসাবে গ্রহণ না করে তাঁকে বিশেষ মর্যাদায় বরণ করে নিয়েছেন। ব্যক্তিগত শোক-দুঃখ একদিকে যেমন তাঁকে গভীর শূন্যতায় পর্যবসিত করেছিল, তেমনি শূন্যতার মধ্যে পূর্ণতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন, পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না, সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে সব পাওয়া পেল না।[৮] এইভাবে অসীম দুঃখকে সকল সুখের সারে পরিণত করে তিনি আপন জীবন ও সেই জীবনে দুঃখের দানকে প্রত্যাশিত অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তাই তিনি বলেছেন[৯]—

'রক্তের অক্ষরে লিখিলাম
আপনার রূপ
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালবাসিলাম
সে কখনও করেনা বঞ্চনা
আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন
সত্যের দারুণ মুল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে।'

-এইভাবে দুঃখ ও মৃত্যুভাবনার মধ্যে নিহিত রয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা। জীবনে দুঃখ ও মৃত্যুকে অস্বীকার করে নয়, বরং এগুলিকে অপরিহার্য ঘটনা হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে এগুলিকে জয় করার কথা বলা হয়েছে রবীন্দ্রদর্শনে।

রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রেরণা হিসাবে ভারতীয় দর্শনে স্থিত দুঃখ ও মৃত্যুচেতনা নিঃসন্দেহে ক্রিয়াশীল হয়েছে। প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনে মানব জীবনে দুঃখবোধ ও জন্ম-মৃত্যু রূপ সংসারচক্র স্বীকার করা হয়েছে। বন্ধনকেই দুঃখের মুল কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে দুঃখের স্বরূপ ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। যেমন, আত্মা-দেহ এই বিষয় সংকল্পই হল দুঃখ।[১০] কিংবা বলা যায় বিষয় সংকল্পই হল দুঃখ।[১১] আবার গীতায় বলা হয়েছে জন্ম, মৃত্যু এবং জরা হল দুঃখ।[১২] জন্ম- মৃত্যুই হল জীবের যথার্থ বন্ধন, এদের নাশেই মুক্তিলাভ ঘটে। শোক, তাপ, পীড়া প্রভৃতি বাধনা যার স্বরূপ তাই হল দুঃখ।[১৩] এই প্রকার দুঃখের দ্বারা পীড়িত হয়ে জীব দুঃখনাশের চেষ্টা করে।[১৪] জন্মগ্রহণই দুঃখের মূল কারণ হওয়ায় আত্যান্তিক ভাবে দুঃখের নাশ বা জন্মের নাশ ঘটলে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। তবে কোন ভারতীয় দর্শনে দুঃখের বেদনাকে পরিণামী সত্যের র্ম্যাদা প্রদান করা হয়নি; বরং তাঁকে অতিক্রম করে যাওয়াই হল তাঁদের পরম লক্ষ্য। সকল আস্তিক ভাবনাতে দুঃখ ও মৃত্যুযন্ত্রণা প্রতিফলিত হয়েছে কল্যাণ পরিণামী পূর্ণসিদ্ধির সোপান স্বরূপে। তাদের মতে, দুঃখবেদনার দহন জ্বালায় মনুষ্য অন্তরকে শুদ্ধ করে উদ্ধতর চেতনায় উন্নীত হওয়া সম্ভব।

দুঃখের বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হলে দুঃখাতীত তীর্থে পোঁছানো সম্ভব। তাই দুঃখের বেদনা চিত্তকে বিদীর্ন করে দিলেও মুমুক্ষুর কাছে তা পরমকাম্য। জীবন - মৃত্যুর এই নিয়ত ক্রমের মধ্য দিয়ে জীব তাঁর কর্ম অনুযায়ী সুখ, দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়ে থাকে। বেদ প্রভাবিত এই সব ভাবনার মধ্যে পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একে 'মানব দেবতা' নামে আখ্যায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় মানুষ তাঁর জীব সীমা অতিক্রম করে দেবত্বের অধিকার লাভ করেছে। এই মানব সত্য তথা মানবতার আদর্শে পরিপূর্ণতার আভাস লাভ করে স্বেচ্ছাবৃত কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমেঃ 'এই সত্যকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করি আমাদের সংকল্পে, আমাদের ধ্যানে, আমাদের আদর্শে, সেই অভাবনীয় পূর্ণকে দেখতে পাই দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে'।[১৫] এইভাবে চেতনার প্রসারণে দুঃখ ও মৃত্যুর আঘাত তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই তিনি বলেন অহং সীমার মধ্যে অবস্থিত যে সুখ, দুঃখ, আত্মার সীমায় তাঁর রূপান্তর ঘটে। যে মানুষ সত্যের নিকট জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের জন্য, লোকহিতের জন্য যে বৃহৎ ভূমিকায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে, ব্যক্তিগত শোক, দুঃখ তাঁর কাছে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। যে মানুষ সহজেই সুখ ত্যাগ করতে পারে, সে দুঃখকে স্বীকার করে দুঃখকে অতিক্রম করে। আপনাকে বৃহৎ জগতে উপলব্ধি করাই হল সত্য। নিজেকে অহং সীমায় অবরুদ্ধ জানাই হল অসত্য। ব্যক্তিগত দুঃখই হল এই অসত্য।[১৬]

রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে মানুষের মধ্যেই দুটি পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন- মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ অহং এবং সীমা অতিক্রমী ভূমাবোধ। এই দুই প্রকার সত্তার বিরোধের মধ্যে মানব স্বভাবের বেদনাবোধের উপাদান বিদ্যমান। তাই রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে, জরা, ব্যধি ও মৃত্যু অধ্যুষিত এই জগত মহাদুঃখের আধার। এগুলি হল মানুষের নিত্যসঙ্গী। এছাড়াও অতৃপ্ত কামনা, বাসনা, আসক্তি, অপ্রিয় সংযোগ, না পাওয়ার বেদনা, প্রাপ্তবস্তু হারানোর ভয়, প্রভৃতির কারনে সাধারতাই বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়েছে, মানুষের দুঃখবিহীন জীবন কল্পনাতীত। মানুষ শোকে দুঃখে কাতর হয়ে থাকে। সম্ভবত এই কারণে মানবশিশু জন্মের পর ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে নিজ অস্তিত্ব ঘোষণা করে। তাই বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়েছে, মানুষের দুঃখবিহীন জীবন কল্পনাতীত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও একথা বলেছেন যে, - 'দুঃখের যত প্রকার ব্যাখ্যা করি না কেন দুঃখতো দুঃখই থাকিয়া যায়, না থাকিয়া যো নাই...'।[১৭] এই দুঃখময় জাগতিক প্রকৃতিকে জয় করে জীনত্ব বা অহর্ত প্রাপ্তির কথা বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। জীবন দুঃখময় হওয়ায় জীবনের প্রতি মমতা বা তৃষ্ণাই হল সকল দুঃখের কারণ। কিন্তু জীবন প্রেমী রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা হল এই যে, তিনি জগত ও জীবনকে দুঃখময় বলে অভিহিত করেননি। তাঁর মতে, দুঃখের কারণ হল জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা। এইক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বেদান্ত অভিমত অনুসারী। দুঃখ ও মৃত্যু বিষয়ে তাঁর ধারণা, হৃদয়ে দুঃখবোধের প্রতিফলন, এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া এই অভিমতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে দুঃখের অভিজ্ঞতা নানাভাবে আবির্ভুত হয়েছে। তাঁর দুঃখচেতনার প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি হল ব্যক্তিগত। তাঁর মানসিকতা অহং বোধের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বপ্রকৃতিতে, আত্মিক সীমাহীনতার অনুভুতিতে প্রসারিত হয়েছে একথা সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই বিশ্বপ্রকৃতি, অসীম অনুভুতি একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব ধ্যান ধারণার আলোকে আলোকিত। দুঃখকে তিনি সর্বদাই ব্যক্তিচিত্তে তাঁর প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে বিচার করেছেন। সেই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দুঃখের কোন স্বরূপ ফুটে ওঠে সেই বেদনাকে কিভাবে রমণীয়, বরণীয় করা যায় তাই রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট।[১৮] রবীন্দ্রজীবনে প্রাপ্ত অসংখ্য দুঃখের মধ্যে মৃত্যুর বিয়োগজনিত ব্যথা, বেদনা, তাঁর চিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। স্ত্রী, সন্তান, সন্ততি, পিতামাতা, ও অপরাপর প্রিয়জনের মৃত্যু তাঁকে এই প্রকার দুঃখ দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন একপ্রকার মৃত্যুমিছিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। ছোটভাই বুধেন্দ্রনাথ যখন মারা যান, তখন রবীন্দ্রনাথ এতটাই ছোট ছিলেন যে, সেই মৃত্যু তাঁর স্মৃতিতে বিশেষ কোন দাগ কাটেনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় যে সব মৃত্যুর সন্মুখীন হয়েছিলেন, সেগুলি হল[১৯] –

১৮৭৫- সারদা সুন্দরী দেবী, মাতা
১৮৮১- গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র
১৮৮৩- সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, জামাইবাবু যিনি রবীন্দ্রনাথের বিয়ের রাতে মারা যান।
১৮৮৪- হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেজদাদা
১৮৮৪- কাদম্বরী দেবী, নতুন বৌঠান, যিনি আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেন।
১৮৯৪- বিহারীলাল চক্রর্বতী, আদর্শ কবি, মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের বেয়াই
১৮৯৫- অভিজ্ঞা চট্টোপাধ্যায়, ভ্রাতুষ্পুত্রী
১৮৯৭- সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভগ্নীপতি, ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত
১৮৯৯- ঊষাবতী চট্টোপাধ্যায়, ভ্রাতুষ্পুত্রী
১৮৯৯- বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র, যক্ষায় মৃত
১৯০১- নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯০২- মৃণালিনী দেবী, স্ত্রী, (২৯ বয়সে মারা যান)
১৯০৩- বিমানেন্দ্রনাথ রায়, বাবার শ্যালকের ছেলে
১৯০৩- দ্বিতীয় কন্যা, রেনুকা ভট্টাচার্য, যক্ষায় মৃত
১৯০৫- পিতা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯০৭- শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কনিষ্ঠ পুত্র, কলেরায় মৃত
১৯০৮- সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রেনুকার স্বামী
১৯০৮- হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র,
১৯১০- নৃপময়ী ঠাকুর, বৌদি, মৃণালিনীর শিক্ষিকা
১৯১৩- জানকীনাথ ঘোষাল, ভগ্নিপতি, ’ভারতী’র সম্পাদক
১৯১৫- বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা
১৯১৬- শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগ্নের ছেলে
১৯১৮- ইরাবতী মুখোপাধ্যায়, ভাগ্নি, বাল্যসখী
১৯১৯- জ্যোতিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, দাদার মেয়ের ছেলে, শৈশবে কবিতার শিক্ষাদাতা
১৯১৯- সুকেশী ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্রের স্ত্রী
১৯২০- শরৎকুমারী মুখোপাধ্যায়, দিদি
১৯২০- সৌদামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, দিদি
১৯২২- তিভাসুন্দরী চৌধুরী, ভাগ্নি

১৯২২- সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা
১৯২৩- সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা
১৯২৪- আশুতোষ চৌধুরী, ভাগ্নির স্বামী
১৯২৪- বিনয়িনী চট্টোপাধ্যায়, বেয়াই, পুত্র রথীন্দ্রনাথের শাশুড়ি
১৯২৫- হিরণ্ময়ী মুখোপাধ্যায়, ভ্রাতুষ্পুত্রী
১৯২৫- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নতুন দাদা
১৯২৬- দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বড় দাদা
১৯২৯- অরুনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র,
১৯২৯- মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথের জামাতা, কবির প্রিয়পাত্র
১৯২৯- সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র,
১৯৩২- নীতিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দৌহিত্র
১৯৩২- স্বর্নকুমারী দেবী, দিদি
১৯৩৩- সত্যগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, ভাগ্নে
১৯৩৫- দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র,
১৯৩৭- ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র,
১৯৩৮- গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাকার ছেলে
১৯৪০- সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র,
এছাড়া বহু নিকট আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের মৃত্যুকে অতি নিকট থেকে উপলব্ধি করেছেন।

রবীন্দ্র জীবনে প্রথম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ঘটে মাতা সারদা সুন্দরী দেবীর মৃত্যুতে। এই প্রসঙ্গে জীবন স্মৃতিতে তিনি বলেছেন, সেই মৃত্যু 'সুখ তৃপ্তির মতো প্রশান্ত ও মনোহর' ছিল।[২০] এক জীবন থেকে মা যে অন্য আর এক জীবনে চলে গেলেন তাতে যে বিচ্ছেদের শুন্যতা সৃষ্টি হল এমন কিছুই মনে হল না বালক রবীন্দ্রনাথের। এর পরে কবির অনেক আত্মীয়দের মৃত্যু ঘটে গিয়েছে। কিন্তু সব মৃত্যুই কবির জীবনে দীর্ঘকাল প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তবে, মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর প্রকৃত পরিচয় ঘটে নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে। এটি রবীন্দ্র জীবনে প্রথম যথার্থ মৃত্যুর অভিজ্ঞতা। এই মৃত্যুকে তিনি সুদৃঢ় ও প্রসারিত দৃষ্টি দিয়ে মুক্তি রূপে অনুভব করেছেন। '...এইটেকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম, তেমনি সেই ক্ষনেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তিবোধ করিলাম'।[২১] পরবর্তী কালে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুতে তিনি মৃত্যুর নতুন রূপ লাভ করেন। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে তিনি গভীর ভাবে শোকাহত হয়েছিলেন। এই মৃত্যুর ঘটনা তাঁকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন দর্শনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই তিনি বলেছেন—

'তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিলায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।'[২২]

স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পরে আরও অনেক মৃত্যুর আঘাত এসেছে তাঁর জীবনে। সেগুলিকে তিনি আপন উপলব্ধির দ্বারা অতিক্রম করেছেন। তিনি পুত্র, কন্যা, জামাতা, পিতা, বন্ধু সবই হারিয়েছেন। কিন্তু এই সকল মৃত্যুর আঘাত তাঁকে বিশেষ ভাবে বিচলিত করতে পারেনি। তবে শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু কবির অন্তরে গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছিল। দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথ মারা গেলে তিনি ছোট মেয়ে মীরাকে একটি চিঠি লেখেন, সেই চিঠিতে ছিল ছোট ছিল শমীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ, সেখানে তিনি বলেছেন- 'যে রাতে শমী চলে গিয়েছিল, সে রাতে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলাম বিরাট বিশবসত্তার মধ্যে তাঁর গতি হউক, আমার শোক একটুও তাঁকে পেছনে না টানে'।- এইভাবে আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গের সুদীর্ঘ মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্র জীবন

বারমাস্যায় পিতা নেই, মাতা নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র-কন্যারা নেই -রবীন্দ্র জীবনে ’নাই-ময়’ স্মৃতি তাঁকে পৌছে দিয়েছিল অস্তিত্বের পরপারে।[২৩]

এইভাবে কৈশোরে মা, যৌবনে প্রাণপ্রিয়া বৌঠান, একে একে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা- সবকিছু হারিয়ে বিষাদঘন জীবনে ভেবেছেন আত্মহননের কথা, তাই তিনি বলেছেন—

‘ওগো আমার দিনের পরে দিন
কথায় হল লীন
কেবল ভাষা হারা অশ্রুধারায়
প্রান উঠে কেঁদে।[২৪]

এইভাবে ঈশ্বর যেন রবীন্দ্রনাথের মাথায় ক্রমানুযায়ী দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি হলেন পৃথিবীর বিরলতম ব্যক্তি যিনি আমৃত্যকাল ধরে মৃত্যুর রক্তচক্ষু প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রবীন্দ্র জীবনে এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর এই পৌনঃপৌনিকতা কখনোই তাঁকে বাকি পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁর গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন প্রবন্ধে লিখেছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস অন্য যেকোন সাধারণজন এরকম আঘাতের পর আঘাত পেলে কিছুতেই আর সুস্থ জীবন যাপন করতে পারত না। অথচ রবীন্দ্রনাথকে দেখলে কিছুতেই মনে হত না কতখানি শোক তিনি বুকের মধ্যে বহন করে বেড়াচ্ছেন।

এর পরিণতি স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের মনে জীবন, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ সম্পর্কে প্রকাশ পেয়েছে শোক, হতাশা ও নৈরাশ্যবোধ। এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি হল খণ্ডিত, আংশিক। এই প্রকার মনোভাবে মৃত্যু হল প্রলয়ের দুত, সে রুদ্র, শৈব, সে জীবনকে গ্রাস করে। এইভাবে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের উপলব্ধি ঘটে। জীবনের শেষ পর্বের রচনায় মৃত্যু সম্পর্কে এরূপ মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা গেলেও মুলত প্রাক-নৈবেদ্য পর্বের রচনায় খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। মৃত্যু বিষয়ে যদি খণ্ডদৃষ্টি পরিত্যাগ করে সামগ্রিকদৃষ্টি গ্রহণ করা যায়, তবে উক্ত বিষয়গুলির আপাত বিরোধ দুরীভুত হয়। পরবর্তীকালে উপনিষদীয় ভাবধারায় পরিপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি নানাবিধ কাব্যিক উপমা ব্যবহার করে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবন-মৃত্যুকে একে অপরের পরিপুরক বলে অভিহিত করেছেন। আবার কখনো মৃত্যুর বিরুদ্ধে সগর্বে ঘোষণা করেছেন ’আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়’। তাই জীবনের পরবর্তী পর্যায়গুলিতে মৃত্যুকে পরাজিত করে জীবনকে জয়ী করার আহবান জানিয়েছেন—

‘দুঃখের পথে তোমার তুর্য বাজে
অরুন বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে
মৃত্যুর হোক লয়
তোমারি হোক জয়।[২৫]

সুখে, দুঃখে সম মনোভাবাপন্ন হয়ে অর্থাৎ উভয়ের প্রতি উদাসীন ও নির্লিপ্ত মনোভাব গ্রহণ করে গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় জীবন যাপন করতেন ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ।

প্রকৃতপক্ষে, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবন-মৃত্যু, পাওয়া-না পাওয়া সব কিছুই একে অপরের পরিপুরক। এদের একটির জন্য অপরটি তাৎপর্যপূর্ন হয়ে ওঠে। তাই উভয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণ দুর্নিবার। ‘...সেই পাওয়াতেই মানুষের মন আনন্দিত, যে পাওয়াটির সাথে না পাওয়া জড়িয়ে আছে‘।[২৬] ব্যক্তিগত অহং কেন্দ্রিক জীবনে এগুলিকে আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হলেও ব্যাপক অর্থে তা একই জীবন ধারায় অঙ্গ, তা একই পরমসত্তার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তাঁর ভাষায়—

'হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে
কাঁপে ছন্দে ভাল মন্দ তালে তালে
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।'[২৭]

পরমসত্তা নটরাজের নৃত্যের ছন্দের দুটি পদক্ষেপ হল সুখ-দুঃখ, জীবন -মৃত্যু ভাঙাগড়া এদের সব কিছুকে জড়িয়ে রয়েছে এক পরমানন্দের প্রকাশ। এগুলির মধ্যে সেই আনন্দের অভিব্যক্তি ঘটেছে। এর ফলে সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি খেলার আনন্দের উপাদান হয়ে দাড়ায়। তাই তিনি বলেছেন—

'এই জীবন মরণ খেলায়
মোরা মিলিত তারি মেলায়
এই দুঃখ সুখের জীবন মোদের
তারি খেলার অঙ্গী।'[২৮]

এইভাবে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আংশিক দৃষ্টি পরিত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপক অর্থে সমগ্র বিশ্বজগতকে পরমসত্তার লীলাময় প্রকাশ রূপে উপলব্ধি করেছেন। তার কাছে মৃত্যু শোকজনিত দুঃখ বেদনার অনুভুতি কিংবা কষ্টদায়ক নয়, বরং তা আনন্দের প্রকাশ মাত্র। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে দুঃখ, কষ্ট, হাসি, কান্না, শোক, বিষাদ, জীবন মৃত্যুর মধ্যে আপাত প্রতীয়মান বিরোধ থাকলেও পরমানন্দের প্রকাশ রূপেতে তা আনন্দের উপাদান মাত্র। তাই মৃত্যু জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, তা জীবনের অবস্থান্তর মাত্র। কালের প্রবাহে এক জীবন ধারার অবসান ঘটে, এবং পরবর্তী জীবন ধারার উদ্ভব ঘটে। তাঁর ভাষায়—

'যা ফুরায় তা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে আলোকে
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নতুন উঠবে ফুটে
জীবনে ফুল ফোটা হলে
মরণে ফল ফলবে।'[২৯]

তাই রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় মৃত্যু মানব জীবনের কেবল নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডি নয়, প্রবঞ্চনা মাত্র নয়, বরং শুন্য, তবু সে শুন্য নয়' এরূপ দৃষ্টি গ্রহণ করে দুঃখ ও মৃত্যুকে জীবনে বরণ করে এবং তাঁকে অতিক্রম করে পরিণামে মানুষকে পৌছাতে হবে অমৃতে। যেখানে ব্যক্ত আমি অব্যক্ত আমিতে উপনীত হতে পারে। আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ক্ষুদ্র আমিকে অতিক্রম করে বৃহৎ আমিকে উপলব্ধি করতে পারলে সীমার মাঝে অসীমের উপলব্ধি ঘটবে- আত্মোপলব্ধি ঘটবে এবং ভুমানন্দ লাভ সম্ভব হবে। জীবন কেন্দ্রিক ছোট ছোট দুঃখকষ্ট গুলি তুচ্ছ বোধ হয়। পরমসত্তা তথা আপন জীবন দেবতা মাঝে দুঃখ-কষ্ট, হাসি-কান্না, জীবন-মৃত্যু সবকিছু অমৃতের উপাদান হয়ে দাড়ায়। এর ফলে মানুষ অপূর্ণতা জয় করে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হতে পারে। এই অমৃতত্ব প্রাপ্তির জন্য দুঃখ ও মৃত্যুবরণকে একান্ত কাম্য বলে মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তিনি বলেন—

'তোমার অসীমে প্রান মন লয়ে
যতদুরে আমি ধাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু
কোথাও বিচ্ছেদ নাই।'[৩০]

পরিশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন ও মৃত্যু তাৎপর্যময়। মৃত্যুই মানবজীবনের একমাত্র নিশ্চল সত্য, অবধারিত নিয়তি- একথা তিনি অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা সঞ্জাত জীবনবোধ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। দেহমনের সুদুর পারে/হারিয়ে ফেলি আপনারে- এই বোধ হল তাঁর মৃত্যুবোধের অভিজ্ঞান। জীবনে মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, মৃত্যুই জীবনের শেষ কথা নয়, রূপান্তর মাত্র। মৃত্যুই জীবনকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে; জীবন পরম্পরার মধ্য দিয়ে সার্থক ও পরিপুর্ণ লক্ষ্যে পৌছে দেয়। জীবনের পরিপুর্ণ বিকাশের জন্য মৃত্যু প্রয়োজন। তাই তিনি স্পষ্টতই দাবি করেন দুঃখ ও মৃত্যুর আঘাতেই মানুষের অহং চেতনার বন্ধন ছিন্ন হয়ে ভুমাবোধে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে।

তথ্যসুত্র:

১) রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা (২০০৮), দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৩৫
২) রবীন্দ্র সাহিত্য: মৃত্যুর অমৃত পাত্রে (১৯৮৪), শিশির কুমার সিংহ, দেজ পাবলিশিং কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪২
৩) যাত্রী (১৯২৫), রবীন্দ্র জীবনী (৩য় খণ্ড), শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৫৩
৪) রবীন্দ্র সাহিত্য: মৃত্যুর অমৃত পাত্রে (১৯৮৪), শিশির কুমার সিংহ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৪
৫) Personality, Rabindranath Tagore, Page-57
৬) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা (২০০৮), দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৭
৭) রবীন্দ্র দর্শনে মুক্তিভাবনা (২০০৬), কল্পনা পাল চৌধুরী, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৫
৮) শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী (১৯৯২), র.র. (১৪ খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-৬৫৭
৯) শেষলেখা, ১১ নং কবিতা, র.র. (১৩ম খণ্ড) (সুলভ সংস্করণ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-১২২
১০) 'দেহোহমিতি সংকল্পস্তদ্দুঃখমিতি চোচ্যতে'- তেজোবিন্দু উপনিষদ
১১) 'বিষয় সংকল্প এব দুঃখম'- নিরালম্ব উপনিষদ
১২) 'জন্ম-মৃত্যুজরাদুঃখৈবিমুক্তোহমৃতমন্নুতে'- গীতা ১৪/২০
১৩) 'বাধনা লক্ষণম দুঃখম'- ন্যায় দর্শন ১/১/২১
১৪) সাংখ্যকারিকা, ১
১৫) ভূমিকা, মানুষের ধর্ম, র.র. (১২ খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-৫৭৫
১৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৫৯৩
১৭) ধর্ম, দুঃখ নামক প্রবন্ধ, র.র. (৭ম খণ্ড) (সুলভ সংস্করণ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-৪৯০
১৮) রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান (১৩৯২), জয়ন্তী ভট্টচার্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৪-১৫
১৯) আনন্দ বাজার পত্রিকা, শনিবার, ৬ই আগস্ট, ২০১৬
২০) মৃত্যুশোক, জীবন স্মৃতি, র.র. (৯ম খণ্ড) (সুলভ সংস্করণ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-৫০৮
২১) তদেব, পৃষ্ঠা-৫০৯
২২) স্মরণ (কাব্যগ্রন্থ), ১৩ নং কবিতা, র.র. (৪ম খণ্ড) (সুলভ সংস্করণ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ৩২৪
২৩) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা (২০০৮), দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৬২
২৪) অচলায়তন, র.র. (৬ম খণ্ড) (সুলভ সংস্করণ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-৩২৭
২৫) গীতালী, ১০১ নং কবিতা, র.র. (৬ম খণ্ড) (সুলভ সংস্করণ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ২২৪
২৬) পাওয়া না পাওয়া, শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী, র.র. (৭ম খণ্ড) (সুলভ সংস্করণ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ৬৭৮
২৭) অরূপরতন, র.র.(৭ম খণ্ড) (সুলভ সংস্করণ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-২৭৯
২৮) অচলায়তন, র.র.(৬ম খণ্ড) (সুলভ সংস্করণ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-৩৪৪
২৯) গীতালী,৩৮নং কবিতা, র.র. (৬ম খণ্ড) (সুলভ সংস্করণ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ১৯১-৯২
৩০) নৈবেদ্য, ১৪ নং কবিতা, র.র. (৪ম খণ্ড) (সুলভ সংস্করণ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ২৭২